এইসময়

* কথাসরিৎ *

যে সকল সামাজিক নিয়ম এই স্বাধীনতার স্ফূর্তির ব্যাঘাত করে, তাহা অকল্যাণকর এবং যাহাতে তাহার শীঘ্র নাশ হয়, তাহাই করা উচিত।

— স্বামী বিবেকানন্দ

বিপদ

আফগানিস্তান-পাকিস্তানের হিন্দুকুশ পর্বত সংলগ্ন অঞ্চলের সাম্প্রতিক ভূকম্পে তিন শতাধিক মানুষের মর্মন্তুদ মৃত্যু ভারতের সামনে ফের এক জরুরি সতর্কবার্তা দিয়ে গেল। কাশ্মীর উপত্যকা এবং দিল্লি সহ উত্তর ভারতের বেশ কিছু অঞ্চলেও এই কম্পন অনুভূত হয়েছে। বাস্তব এটাই যে ভারতবর্ষের ৫৯ শতাংশ অঞ্চল মাঝারি থেকে উচ্চ মাত্রার ভূকম্পের সম্ভাবনা যুক্ত এলাকার অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে বিশেষ ভাবে বিপজ্জনক অঞ্চলের মধ্যে পড়ে শ্রীনগর ও গুয়াহাটির মতো শহর। বিপদের সম্ভাবনার নিরিখে এর পরের তালিকাতেই আছে দিল্লি, পাটনা, দেরাদুন, অমৃতসর, জলন্ধর এবং মিরাট। আর তার পরের ধাপেই কলকাতা, মুম্বই, চেন্নাই, আহমেদাবাদ, লখনৌ, বারানসি, কটক, পুনে এবং কোচি। সহজ কথায়, ভারতের প্রায় সব ক'টি বড়ো শহর যে কোনও মুহূর্তে বিধ্বংসী ভূকম্পে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে যে কী ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। কিছু কাল আগেই আর এক প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালে সেই ধ্বংসের রূপ দেখা গিয়েছে। যেমন দেখা গিয়েছিল ১৯৯৩ সালে মহারাষ্ট্রের লাটুর অঞ্চলে এবং ২০০১ সালে গুজরাটের ভূজ অঞ্চলেও। কাজেই ভূকম্পের বিপদের সতর্কবার্তা এ দেশে নতুন নয়। প্রশ্ন হল বারংবার এই সব শতর্কবার্তার ফলে দেশজুড়ে ভূকম্প মোকাবিলার কতটা প্রস্তুতি দেখা গিয়েছে? দুর্ভাগ্যবশত, এ প্রশ্নের সরল উত্তর— কার্যক্ষেত্রে প্রায় কিছুই দেখা যায়নি বলা চলে।

ভূজের ভয়ঙ্কর ভূকম্পের পর 'ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি' নামক একটি সংস্থা গঠিত হয়েছে বটে, ভূকম্প-রোধী বাড়ি তৈরির উদ্দেশে কিছু নিয়ম-কানুনও চালু করা হয়েছে, কিন্তু সে উদ্যোগ আর বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। ভূকম্প মোকাবিলার বিষয়ে যে জাতীয় নির্দেশাবলী তৈরি করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি এবং রাজ্যসরকারগুলি কার্যক্ষেত্রে এগুলি কতটা প্রয়োগ করছে। দু'বছর আগে 'ক্যাগ'-এর এ সংক্রান্ত রিপোর্ট অত্যন্ত উদ্বেগজনক। দেখা যাচ্ছে আইনগুলি খাতায় কলমেই রয়ে গিয়েছে। আশা করা যায় অতঃপর কেন্দ্র ও রাজসরকারগুলি নড়েচড়ে বসবে। প্রথমেই প্রয়োজন দেশজুড়ে, বিশেষত শহরগুলির, ভূকম্পের বিপদের সম্ভাবনা অনুযায়ী পুঙ্খানুপুঙ্খ মানচিত্র তৈরি করা। সেটি তৈরি হওয়ার পরেই একমাত্র সম্ভাব্য বিপদের মাত্রা অনুযায়ী সেই বিপদের মোকাবিলার এলাকা ভিত্তিক প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব। দেশজুড়ে কোটি কোটি মানুষ প্রতিনিয়ত বিপুল বিপদ মাথায় নিয়ে দিন কাটান। এই পরিস্থিতিতে সরকারি গড়িমসি অমার্জনীয়।

বুনিপ?

ভারত এবং আফ্রিকা মহাদেশের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে উচ্চপর্যায়ের আলাপ আলোচনা শুরু হয়েছে। এই ধরনের শীর্ষ বৈঠকগুলিতে কূটনৈতিক নানা কৌশল ব্যবসা বাণিজ্যের হিসেবনিকেশ, সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান নিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা হয়ে থাকে। ভারতবাসী আফ্রিকার মানুষদের ভালো চাইছেন সে ব্যাপারটি মন্দ নয়, তবে খানিকটা সন্দেহ থেকেই যায়। নেলসন ম্যান্ডেলা দীর্ঘ কারাবাস থেকে মুক্তি পাবেন, ভারত সফরে এসে উপচে পড়া গ্যালারির দিকে তাকিয়ে স্মিত হেসে হাত নাড়বেন, সে মহাদেশ থেকে বরাবরের মতো বর্ণবৈষম্যের মহীরুহ উৎপাটিত হবে এতে সাধারণ ভারতবাসীর আপত্তি ছিল না, এখনও নেই। কিন্তু যে শতাব্দী প্রাচীন, আজন্ম লালিত বৈষম্য-বটচ্ছায়ে নিজেদের বাস, সেইটির গোড়ায় ঘড়া ঘড়া জল ঢালা থামেনি এক মুহূর্তের তরেও। সে আস্তানায় আয়েশ করে বসে তাবৎ কালো-মানুষদের নিগ্রো বলা যায়

নিছক 'সহিষ্ণুতা' নয়, সমতা, স্বীকৃতি ও সম্মানের ভাষায় কথা বলা বহুত্ববাদী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত

কী খাব, তা সাম্প্রদায়িক শক্তিই বলে দেবে?

স্বাধীন মতপ্রকাশ ও নিজ মতে জীবনযাপন করার মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপের মতো ঘটনা বেড়ে যাওয়া বিপজ্জনক। লিখছেন **মইদুল ইসলাম**

উদয় দেব

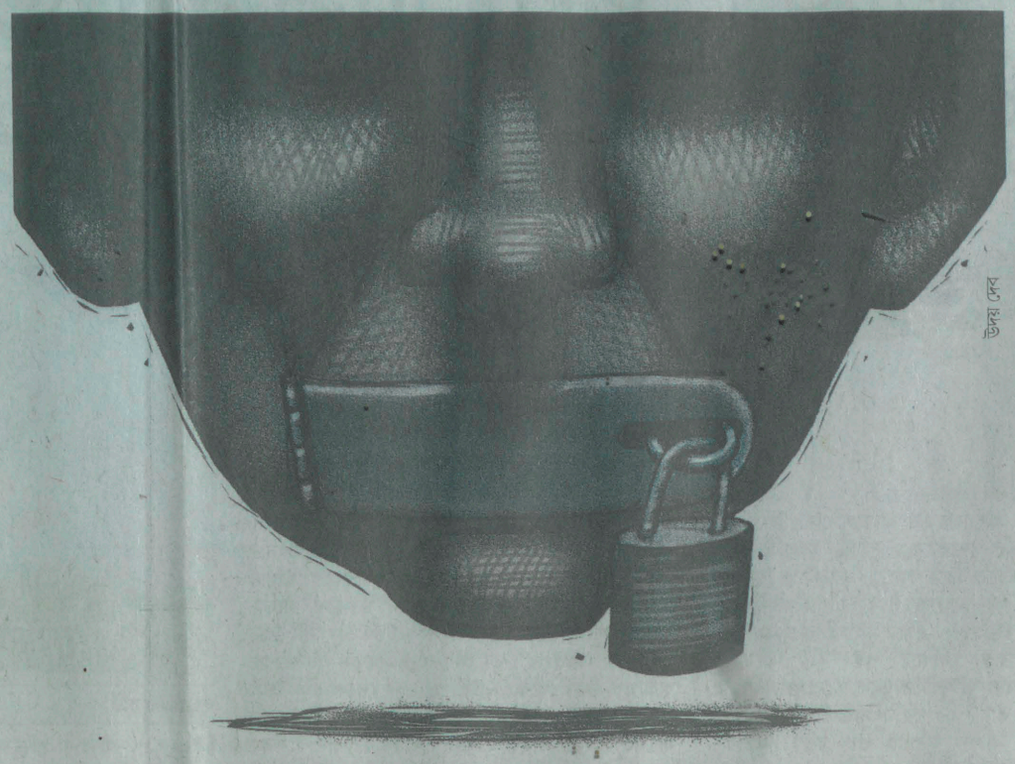

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট বিজয়লাভ করার পরেই, সংঘ পরিবারের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা সাম্প্রদায়িক হিংসায় লিপ্ত হচ্ছে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে এবং গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাথায় আরএসএস-এর আস্থাভাজন কাউকে বসাচ্ছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বড় সংগঠিত ধর্মকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় মৌলবাদ মাথা চাড়া দেওয়ার রাজনৈতিক ইতিহাস অনেকের জানা। তাই রাজধানী নিকটবর্তী পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের দাদরি-তে গোমাংস খাওয়ার 'অপরাধে' একদল উন্মত্ত বর্বর জনতার হাতে মহম্মদ আখলাখের মর্মান্তিক মৃত্যু কোনও বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। ওই ঘটনা একটা পরিকল্পিত রাজনৈতিক ছকের অংশবিশেষ। সেই ছকেই সফদর হাশমি, নরেন্দ্র অচ্যুত দাভোলকার, গোবিন্দ পানসরে, এম এম কালবুর্গির মতো প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী মানুষদের হত্যা করা হয়। সেই ছকেই বাংলাদেশে আহমেদ রাজীব হায়দার, অভিজিত রায়, অনন্ত বিজয় দাস এবং ওয়াশিকুর রহমানদের মতো মুক্তমনাদের খুন হতে হয়, হুমায়ুন আজাদকে আক্রান্ত হতে হয়। সেই একই ছকে তসলিমা নাসরিন ও মকবুল ফিদা হুসেনকে দেশছাড়া হতে হয়।

স্বাধীন মতপ্রকাশ ও নিজ মতে জীবনযাপন করার মৌলিক অধিকারে কেউ যদি 'আঘাত হানার' চেষ্টা করে তাহলে আমাদের মুষড়ে না পড়ে সাংবিধানিক ক্ষমতাকে সামনে রেখে ধর্মীয় বাড়াবাড়ি করা সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী শক্তি কে পাল্টা বলা উচিত যে আমরা পাঁঠা, গোরু, শূকর বা নটে শাক খাবো নাকি সত্যজিৎ রায়ের 'আগন্তুক' মনমোহন মিত্রের মতো নরমাংস ছাড়া প্রায় সর্বভুক হব সেটা তোমাদের মতো অবাচীনদের কেন জবাবদিহি করব? বিরোধী মতের সঙ্গে যুক্তিপূর্ণ বিতর্ক না করে তাকে বলপূর্বক দাবিয়ে দেওয়া বা হিংস্র আক্রমণ করা অল্প বিস্তর যে কোনও ধর্মীয় মৌলবাদী সংগঠন, ফ্যাসিবাদ, টোটালিটারিয়ান পার্টি এবং কর্তৃত্ববাদী রাজনৈতিক দলের একটা বিশেষ লক্ষণ। বহুত্ববাদকে বাদ দিয়ে কেবল নিজ দলের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করাই তার লক্ষ্য। হিন্দু জাতীয়তাবাদের নামে আসলে সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী শক্তি, ভারতের বহুত্ববাদী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জগতকে গত কয়েক দশক ধরে একই রঙে রঙিন করার অপপ্রয়াসে ব্যস্ত। ২০০৪ ও ২০০৯ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি মুখ থুবড়ে পড়ায় কিছুটা দমে গেলেও বিগত দু'তিন বছরে আবার তা ধর্মীয় জিগির তোলা লুম্পেনগিরিতে মশগুল হয়েছে।

২০১৩ সালে এক টেলিভিশন চ্যানেলের সাক্ষাৎকারে, নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ, অমর্ত্য সেন [illegible] বলেছিলেন যে একজন ভারতীয় নাগরিক হয়ে, গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীকে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী রূপে দেখতে চান না। কারণ গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী গুজরাটের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। সেই কথা শুনে দিল্লিনিবাসী এক বঙ্গজ সাংবাদিক (যিনি পঙ্কজ চিহ্নে ২০১৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা ভোটে দাঁড়ালেন আর ডাহা হারলেন) বললেন যে অমর্ত্যবাবুর 'ভারতরত্ন' কেড়ে নেওয়া উচিত। অধ্যাপক সেন সরাসরি জবাব দিলেন যে তিনি ভারতরত্ন ফিরিয়ে দিতে পারেন যদি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, অটল বিহারী বাজপেয়ী তাঁকে সে কথা বলেন; কারণ উক্ত সম্মান তিনি বাজপেয়ীর হাত থেকে গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে কেন্দ্রে সরকার পরিবর্তনের কয়েক মাস পরে অধ্যাপক সেনকে প্রায় সম্মানহানি করে বাধ্য করা হল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার জন্য। কেন্দ্রের শাসক দল রাজনৈতিক মতাদর্শগত মতভেদকে ব্যক্তিগত স্তরে নিয়ে গিয়ে প্রতিহিংসাপরায়ণতার পরিচয় দিল।

বর্তমান ভারতে স্বাধীন ও ধর্মনিরপেক্ষ মতামত প্রকাশের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করার প্রতিবাদে বেশ কয়েকজন প্রতিথযশা সাহিত্যিক তাঁদের সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার ফিরিয়ে দিয়েছেন।

দুর্ভাগ্য, এই বিতর্কে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপালের নামটিও জড়িয়ে গিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, সাংবিধানিক পদে থেকেও নিরপেক্ষ অবস্থান না নিয়ে তিনি লেখকদের সাহিত্য আকাদেমি সম্মান ফিরিয়ে দেওয়ার পিছনে রাজনৈতিক অভিসন্ধি ও 'লবি'-র [illegible] প্রসঙ্গ টেনেছেন কী ভাবে? প্রশ্নটিকে সহসা উড়িয়ে দেওয়া কঠিন। পাশাপাশি বিদেশ প্রতিমন্ত্রীর দলিতদের সম্পর্কে কুমন্তব্যটির সমালোচনা না করে তাঁর পাশেই দাঁড়ানোয় এমন তর্কও উঠছে যে, এহেন কাণ্ডে তাঁর পুরানো ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনৈতিক সত্তাটিই বেরিয়ে এল না তো?

গণতন্ত্র তো সংখ্যাতন্ত্র নয়। গণতন্ত্র যেমন মতবিরোধের জায়গা দেবে তেমন সমতা, স্বীকৃতি, সম্মান, মর্যাদার কথা বলবে; ধর্মীয়, জাতিগত, ভাষাগত ও লিঙ্গগত সংখ্যালঘুদের অধিকারের পরিসরকে বাড়াবে।

এক ব্যক্তি কোন পুরস্কার গ্রহণ করবেন এবং গৃহীত পুরস্কার নিজ ইচ্ছায় কখন ফিরিয়ে দেবেন সেটা ব্যক্তিবিশেষের ব্যাপার। ঠিক যেমন ঘৃণামূলক বক্তৃতা ছাড়া কোনও ব্যক্তি কী লিখলেন বা বললেন তাতে সমাজের কিছু বলার থাকতে পারে না, তেমনই পুরস্কার গ্রহণ বা বর্জন ব্যক্তি-স্বাধীনতার ব্যাপার। সে বিষয়ে লেখকের উপরে সমাজের কিছু আশা থাকলেও নৈতিক চাপ সৃষ্টি করা ছাড়া বিশেষ কিছু করার থাকে না।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের অনতিবিলম্ব পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নাইট উপাধি পরিত্যাগ করেছিলেন। ৩০ মে, ১৯১৯ সালে তৎকালীন বড়লাট, লর্ড চেমসফোর্ড-কে লেখা তাঁর ইংরেজি চিঠিটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক অসামান্য বুদ্ধিজীবীর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। ১৯৬৪ সালে, জঁ পল সার্ত্র নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখান করেছিলেন মতাদর্শগত ও ব্যক্তিগত কারণে। তাই সার্ত্র বা রবি ঠাকুরকে ধ্যান জ্ঞান মনে করে কেউ বক্তৃতা ও লেখার ফুলঝুরি করতে পারেন। কিন্তু তিনি নিজে সরকারি-বেসরকারি সাম্মানিক পুরস্কারের ক্ষেত্রে সার্ত্রে বা কবিগুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন কি না সেটা হল একান্ত ভাবেই ব্যক্তির নিজস্ব পছন্দ। ১৯৮৮ সালে সাহিত্যে নোবেলজয়ী মিশরের নাগিব মাহফুজকে যখন এক সাংবাদিক, সলমন রুশদিকে উপদেশ দিতে বলেছিলেন তখন মাহফুজ সক্রেটিসকে উল্লেখ করে বলেছিলেন, ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দ ঠিক করা বা অন্য লেখককে পরামর্শ দিতে তিনি পারেন না। লেখকের হৃদয় তাঁর সবথেকে বড় পরামর্শদাতা।

কিন্তু যেটা একটু ভেবে দেখা দরকার সেটা হল সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে বাংলার প্রবাদপ্রতিম সাহিত্যিকদের হস্তাক্ষর করা বিবৃতিতে 'অসহিষ্ণু'/'সহিষ্ণু' শব্দগুলোর বারংবার ব্যবহার নিয়ে। সহিষ্ণুতা হল 'সহিষ্ণু' ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অপরকে সহ্য করার নৈতিক মান। সেখানে সহিষ্ণু ব্যক্তি/ গোষ্ঠীর মাপদণ্ডে বিচার করা হয় অপরকে/ সহিষ্ণুতকে (যাকে সহ্য করা হচ্ছে)। সে ক্ষেত্রে সহিষ্ণু ব্যক্তি/ গোষ্ঠী মুখ্য আর সহিষ্ণুত ব্যক্তি/ গোষ্ঠী গৌণ। আর একটু গভীরে গিয়ে বলা যায় যে, 'আসলে সহিষ্ণুতকে সহ্য করছি এই তার ভাঙ্গি, আমাদের মহানুভবতা', 'ওদের মত, পথ, জীবনচর্যাকে সহ্য করতে নাও তো পারতাম'! তাই সহিষ্ণুতার পক্ষে উপদেশ ও বক্তৃতা কি সহিষ্ণু ও সহিষ্ণুতের মধ্যে এক অসম সম্পর্ক? অন্যদিকে সম্মান, স্বীকৃতি, সম্ভ্রম বা মর্যাদা কি সমতার সম্পর্ক? এ ক্ষেত্রে কে কাকে সম্মান স্বীকৃতি দেবে সেটাও সঙ্গত প্রশ্ন। রাষ্ট্র অন্য ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মত বা পরমতকে স্বীকৃতি দেবে নাকি সংখ্যাগুরুর মানদণ্ডে বিভিন্ন সংখ্যালঘুর মত ও পথকে স্বীকৃতি ও সম্মান দেওয়া হবে? কিন্তু গণতন্ত্র তো সংখ্যাতন্ত্র নয়। গণতন্ত্র যেমন মতবিরোধের জায়গা দেবে তেমন সমতা, স্বীকৃতি, সম্মান, মর্যাদার কথা বলবে; ধর্মীয়, জাতিগত, ভাষাগত ও লিঙ্গগত সংখ্যালঘুদের অধিকারের পরিসরকে বাড়াবে। সেটাই গণতন্ত্রে কাম্য। সেই বহুত্ববাদী গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে কেবল 'সহিষ্ণুতার' ভাষায় কথা বললে হবে না। সমতা, স্বীকৃতি ও সম্মানের ভাষায় কথা বলা বহুত্ববাদী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করার পূর্বশর্ত। তাই প্রবীণ বুদ্ধিজীবী, অভিজ্ঞ শিল্পকর্মী আর দুঁদে রাজনীতিক এবং সাংবাদিকদের এই ক্ষুদে শিক্ষকের বিনীত অনুরোধ যে পরমতসহিষ্ণু বা পরধর্মসহিষ্ণু শব্দগুলো ব্যবহার করার সঙ্গে কি 'পরমতসম্মান', 'পরমতস্বীকৃতি' এবং 'পরধর্মসম্মান', পরধর্মস্বীকৃতি বলা যায় না। নিজস্ব মত রাখার জন্য 'পরমতগ্রহণ' বা 'পরধর্মগ্রহণ' নাই করতে পারেন। কিন্তু 'পরমতসম্ভ্রম' বা 'পরধর্মসম্ভ্রম' কি আমরা করতে পারি না? আস্তিক নাস্তিক সব মতের প্রতি কি সমতার দৃষ্টিতে দেখা যায় না?

পশ্চিমবঙ্গের অগ্রণী বুদ্ধিজীবীদের, গত দেড় বছরে ঘটে যাওয়া হিন্দুত্ববাদী হিংসা এবং মৌলবাদী ভাবধারার বিরুদ্ধে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে একটু বিলম্বিত বোধোদয় অনেকের বেশ চোখেই লেগেছে। চোখে লেগেছে কালবুর্গি হত্যার প্রায় দু'মাস পরে সাহিত্য আকাদেমির বিলম্বিত প্রস্তাব। উর্দুতে একটা কথা আছে 'দের আয়ে পর্ দুরুস্ত আয়ে' যার তরজমা করলে দাঁড়ায় 'দেরিতে হলেও ঠিক পথে এসেছেন'। কিন্তু মুম্বই শহরের তারকা ক্রিকেটার থেকে শুরু করে হিন্দি ছবির তাবড় অভিনেতারা কী করছেন? তাঁরা তো সিনেমার পর্দায়, বিজ্ঞাপনে ও বহির্জগতে 'মানবতার দূত'। সহনাগরিকদের নির্মম হত্যা ও দেশের গৌরবকে কালিমালিপ্ত করে আসে পাশে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী সম্পর্কে তাদের কোনও বক্তব্য নেই? হয়তো এই বিষয়ে কিছু বলতে তারা আর একটু দেরি করবেন। কিন্তু তত দিনে বেশ দেরি হয়ে যাবে। আশঙ্কা হয় সারা দেশে ধর্মের নামে হানাহানির বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে এবং মৌলবাদী চোখরাঙানিকে উপেক্ষা করে এত দেরিতে 'এ বার কিছু একটা করি' গোছের কর্মকাণ্ড করলে, নবীন প্রজন্ম তাঁদের যেন কৌতুকের সুরে 'দেরি'দা বলে না ডাকে।

লেখক প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক। মতামত ব্যক্তিগত